IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সূর্য দীঘল বাড়ী: দেশভাগ-মন্বন্তরের পটভূমিতে আশাহত নারীর জীবনালেখ্য

কোহিনুর ইসলাম, গবেষক

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত

সারসংক্ষেপ:

দেশ মানে শুধু একটা ভূমিখন্ড নয়, বা ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ কোনো স্থান নয়। দেশ হল মানুষের মন ও মননে অবস্থিত এক সুপ্ত বাসনার স্থান। যার কোনো সীমানা নেই। 'আমার কাছে দেশ মানে এক লোকের পাশে অন্য লোক' – যেখানে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা বিভাজন সম্ভব নয়। তাই আজও বাঙালি স্মৃতি বিজড়িত চোখে সেই স্বপ্ন দেখেই চলছে 'আমার দেশখান বড়ই সুন্দর' – সেই সুন্দর দেশ, শ্যামল দেশ কোন পাপে বিভাজিত হয়েছে? বাঙালি আজও তার রোমন্থন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দেশভাগ একদিকে যেমন জাতি হিসেবে বাঙালির শিহরণ জাগানো সবথেকে খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে তেমনই সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে নারীদেরকে। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, সব দেশে সবকালেই বিবর্তন, দাঙ্গা, জন জাগরণ সর্বত্রই বলি হতে হয়েছে নারীদের। সেই নিঃস্ব নারীদের কথা নিয়ে এই আলোচনা।

মূলশব্দ: রাজনৈতিক অভিসন্ধি, বিভাজন, পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য, নারীর দুর্দশা ও লাঞ্ছনা

আলোচনা:

দেশভাগ শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ একটি ঘটনার বয়ন রূপ নয়, এটি ঘর ভাঙার ইতিহাসও বটে। রাজনৈতিক লড়াই, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে গৃহাঙ্গনের। দেশভাগের জটিল রাজনৈতিক সমীকরণে একটি সুবৃহৎ ভূখণ্ড যেখানে খণ্ডিত হয়ে তিনটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এইভাঙ্গা-গড়ার খেলায় দেশান্তরী হতে হয় লক্ষ লক্ষ নরনারীকে, তাদের দুরাবস্থা ছিল বর্ণনাতীত। দেশভাগে কোটি কোটি মানুষ বিপর্যস্ত হলেও সিংহভাগে ছিল নারীরাই। স্থায়ীভাবে পুরুষের দেশ ত্যাগের ফলে তারা হয়েছে দেশান্তরী। মূলত দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশত্যাগ সবই পুরুষের সৃষ্টি হলেও নারীকে চুকিয়ে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। অগণিত নারীকে বলাৎকার হতে হয়েছে - এই আবর্ত নারীকে চরম সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল হয়তো আমাদের মুক্তি দিয়েছে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু নারীর অবরোধের শৃঙ্খল আজও আগল ছাড়েনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার শাসন প্রণালী, শোষণের রূপ সাময়িক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। লৈঙ্গিক রাজনীতির জাঁতাকলে চাপা পড়ে নারী তার নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। সেই গোলক ধাঁধায় দু একজন নারী নিজেদের উপস্থিতি জানান দেন মুক্তির কথা চিন্তা করে, গোষ্ঠীর অধিকারের দাবি নিয়ে। দেশকাল সময়ের ক্রমান্বয়ে নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের হাতে কলের পুতুল, তারা যেভাবে চালাবে নারী সেভাবেই চলবে নিরন্তর সময় অতিক্রম করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গৌরবের রোষানলে পড়ে নারী নির্মম ভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হতে লাগল অনন্তকাল ধরে। যদিও আজকের দিনে নারীকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাবলম্বী, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখি। কিন্তু সেটাই বা কতটুকু, যেটুকু পুরুষ নারীকে দিয়েছে তার বেশি নয়। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁস আমাদের দেশে যে নবজাগৃতির ঢেউ নিয়ে এসেছিল তাতে লৈঙ্গিক রাজনীতির পটভূমিতে শিশির বিন্দুর মতো নারীর মনের গহীনে নবচেতনার, আত্মসমীক্ষার দোলা দিয়ে যায়। ঊনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ যখন গ্রহণ-বর্জন, আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজে আধুনিকতার বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন, মুসলিমরা তখন তা থেকে অনেক দূরে গিয়ে সেই পুরনো কাঠামোকে আগলে ধরে বাঁচতে চাইলেন, যেখানে নারী প্রতিনিয়ত পণ্যে পর্যবসিত হতে লাগল। তাদের সামান্য অধিকারটুকু দেয়নি পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। সমালোচকের ভাষায়- "পিতৃতন্ত্র প্রণয়ন করেছে বিপুল পরিমাণ আইন বা বিধি নিষেধ, যার এক নৃশংস অংশ সুপরিকল্পিত ভাবে বানানো হয়েছে নারীদের পীড়নের জন্য। পিতৃতন্ত্রের আইন সংস্রয়টি তার বলপ্রয়োগ সংস্থা, যার বিধিগুলো এক বহুমুখী হিংস্র খড়্গ,যা নারীর জীবনের দিকে উদ্ধত হয়ে আছে কয়েক হাজার বছর ধরে, এবং এই খড়্গের ধারাবাহিক বলি নারী"।[১]

শিক্ষার আলো যাতে পর্দার আড়ালে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ফতোয়ার দেয়াল তৈরি করে নারীকে করে রেখেছে যৌনদাসী। লৈঙ্গিক রাজনীতির প্রসঙ্গে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন – "লৈঙ্গিক রাজনীতির চতুর প্রয়োগ করে পুরুষতন্ত্র অপর পরিসরকে নিষ্ক্রিয় ও বিকল্পহীন গ্রহীতায় পরিণত করেছে।... যৌনতা মূলত জৈবিক প্রকরণ নিশ্চয়, কিন্তু এও সমান সত্য যে তা যুগপৎ মনস্তাত্ত্বিক সংস্থানও বটে। যতখানি পুরুষের ততখানি নারীর। অথচ সাহিত্যে শিল্পে প্রত্নকথায় চূড়ান্ত একদেশদর্শী পিতৃতান্ত্রিক নির্মিতির একচেটিয়া উপস্থিতি, কেননা নারীর শারীরিক ও মানসিক ছবিও ভোগী পুরুষের ইচ্ছাপূরণের আয়োজন মাত্র"।[২] তাই নারী ভোগী পুরুষ, যারা পিতৃতন্ত্রের ধারক-বাহক, তারাই নারীর জৈবিক প্রয়োজনকে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, এর মূলে রয়েছে ক্ষমতার প্রভাব। পিতৃতন্ত্রের মধ্যেই এই আধিপত্যবাদের সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বীজটি নিহিত। পিতৃতন্ত্র এমন একটি সমাজ প্রক্রিয়া যাকে সহজে একটি ফ্রেমে বন্দী করা যায় না। সমালোচকের ভাষায়–"patrirchy is the power of the father, a familial social, ideological, political system in men by force, direct pressure or through ritual tradition, law and language, custom, etiquette education and the division of labour, determine what part women shall not play and in which the female is everywhere

subsumed under the male".[৩] এখানে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় পিতৃতন্ত্রের শিকড় কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত। ধর্ম, প্রথা আইন, ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, শ্রম এসব কিছুই পিতৃতন্ত্রের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাবনার একমাত্রিকতা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা, যেখানে মার্কসের সমাজ-ভাবনা এবং ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, যৌনতা ইত্যাদি বিষয় আধুনিকতার তাৎপর্য বয়ে এনেছে। এক্ষেত্রে দেশ বিভাজনে সমাজ ভাবনায় বিষম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের লেখকের রচনায় মধ্যযুগীয় মোল্লাতন্ত্রের প্রভাব কাটিয়ে অন্ধকার সমাজে আধুনিকতার বার্তা বয়ে আনা সহজতর ছিলনা। যেখানে নারীর উপস্থিতি অপরাধ হিসেবে গণ্য হত, যে সমাজে নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকৃত নয়, সেখানে সাহিত্য জগতে তার সংগ্রামী অবস্থান খোঁজা মরুভূমিতে এক ছটাক জল খোঁজার সমান। তবুও আবু ইসহাক তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের মরণপণ লড়াই। শোষক শ্রেণীর নেকড়ে দৃষ্টি- যে দৃষ্টি শুধুই নারীর রক্তমাংসের স্বাদ পেতে চায়।আকাল, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের থেকে বাঁচতে সেদিন নারীকে ভাঙতে হয়েছিল অনুশাসনের বেড়াজাল। পাড়ি দিতে হয়েছে কণ্ঠক বিস্তীর্ণ পথ। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার গলাটিপে দিয়ে সমাজ তার জন্য তৈরি করেছে অবরোধের ঘেরাটোপ- 'যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।' এমনই এক সমাজে জয়গুনের মত হতদরিদ্র সংস্কার বন্দি গোঁড়া মুসলমান পরিবারের অনাথা নারীরা সমস্ত জীবন জুড়ে লড়াই করে চলছে দারিদ্র্যের সঙ্গে, অনিশ্চিত জীবনের দ্বন্দ্বময়তার সঙ্গে, এবং নারীত্বের অভিমানকে ধ্বংস করে দেওয়া পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের লোলুপ দৃষ্টির সাথে। জয়গুনদের লড়াই নারীত্ব, মাতৃত্বকে নিষ্কণ্টক রাখতে, কিন্তু জয়ের শিরোপার মুকুট তাদের মাথায় জোটেনি কোন কালেই। তবুও তারা একসাথে এগিয়ে যায় অজানা কণ্ঠক পথে, লক্ষ্য একটাই- বেঁচে থাকা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখা।

আবু ইসহাক দেখাতে চেয়েছেন মন্বন্তর দেশভাগের প্রভাবে একটি পরিবার কিভাবে সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়,দেশ স্বাধীন হওয়ার বা ভাগ হওয়ার মানবী অস্তিত্বের বিনিময়- বেঁচে থাকার; স্বপ্ন দেখে- ভরা পেটে খেয়ে বাঁচার। একটি অসহায় নারী সেই বাস্তবতায় নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে এক টুকরো ভিটে মাটির, দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের। দুচোখ ভরে মাতৃত্বের পুরনো স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে জয়গুন। অশিক্ষিত, স্বামীহারা, অনগ্রসর মুসলিম সমাজের নারীর চোখে স্বাধীন দেশের ছবি বলতেই ভেসে উঠে সস্তায় চাল ও কষ্টহীন জীবন, স্বপ্নময় বাস্তবতা। সত্যিই যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন জয়গুন স্বাগত জানায় সেই মহোৎসবকে যার প্রতীক্ষা অনেক বছরের। তাই তার সুমধুর স্মৃতির বোম্বাই শাড়ি দিয়ে তৈরি পতাকা উত্তোলনের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের জয়গান গাইতে চেয়েছিল–'একমাত্র সবুজ বোম্বাই শাড়িটার অবশিষ্ট পাড়টা হাসুর দিকে ছুঁড়ে দেয়। যে শাড়িটা তার বধু জীবনের সুমধুর স্মৃতি' - তাই দিয়ে স্বাধীন দেশের প্রথম পতাকা ওড়ে হাসুদের স্থবির গ্রামে।

ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, অশিক্ষা যে সমাজের মূল চাবিকাঠি, সেই সমাজে যখন কোনো নারী প্রচলিত নিয়ম-নীতির বেড়াজাল ভেঙে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে চায় তখন তার দিকে ধেয়ে আসে প্রবল জলোচ্ছাস

তথা সমাজ প্রতিরোধের অনুশাসন। সে অনুশাসনকে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে জয়গুন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করে-'খাইট্টা খামু, কেওড়ডা চুরি কইরাত খাইনা, খ'রাত কইরাত খাইনা। কউক না, যার মনে যা...'ফলে ধর্মান্ধ সমাজে তার কোন স্থান হয় না। এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা, যেখানে তিনি সমাজ সত্যের বাইরে গিয়ে জয়গুনকে তৈরি করেননি, তৈরি করেছেন সমাজের মধ্যে থেকেই। জয়গুনের মনেও ছিল নারীত্ব মাতৃত্বের পূর্ণতায় সার্থক গৃহিণী হিসেবে বেঁচে থাকার স্বাদ, যদিও সমাজ তার সেই ইচ্ছা পূরণ হতে দেয়নি। তাই এই অসময়ে তার পুরনো স্মৃতি গুলি ঘুরপাক খায় মনের অলিতে- গলিতে। স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত জয়গুন কিন্তু স্বামীর পরিচয় মুছে গেলেও ধর্মের অনুশাসনে সে এখনো আবদ্ধ। সমাজের চোখে সে 'বেপর্দা আওরাত'। আর বেপর্দা বেশরম নারী আল্লাহর দরবারে কোন স্থান নেই বলেই মসজিদের ইমাম সাহেব তার পাঠানো উৎসর্গীকৃত মানত বা প্রসাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে হারাম বলে ফিরিয়ে দেয়। ধর্ম যখন ধারণ করার বদলে তাড়ন করে তখন সমাজে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। সেখানে জয়গুণের মতো অসহায় নারীদের হতে হয় ধর্মতন্ত্রের ক্ষমতার আজ্ঞাবহ পুতুলে। এভাবে একটার পর একটা করে সমাজ অনুশাসনের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে একসময় চরম জীবন সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় জয়গুন। যেখানে লজ্জা- ধর্মের তুচ্ছ বিধিনিষেধ মিথ্যে হয়ে যায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছা- 'বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে' এই হয়ে ওঠে একমাত্র জীবনপণ লড়াই। একজন নারীর পক্ষে সেই লড়াই কতটা কঠিন তা জয়গুন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পায়। সমালোচকের ভাষায় – "গ্রামীণ মুসলিম সমাজের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ধর্মব্যবসায়ী ইমাম মৌলবিরা কল্পিত দোজখের ভয়ঙ্কর চিত্র এঁকে মুসলিম নারীদের মনোবল কীভাবে দুর্বল করে ফেলে তারই নজির 'সূর্য দীঘল বাড়ী'র জয়গুন চরিত্র"।[৪] আর এখানেই জয়গুন হয়ে ওঠে সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একজন অক্লান্ত সৈনিক, কঠোর জীবন যুদ্ধের একজন সংগ্রামী নারী হিসাবে।

দারিদ্র নিঃসহায় দিনমজুর জয়গুন চরিত্রের বিকাশের আরেকটি উজ্জল দিক তার মাতৃ হৃদয়ের অসহায় বেদনার প্রতিচ্ছবি, যেখানে মাতৃস্নেহকেও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করে অল্প বয়সের ছেলেকে কাজে পাঠাতে হয় ক্ষুধা নিবারণের জন্য। আবার মায়মুনের বিয়ে দিলে 'তওবা' করতে হবে সমাজ পতিদের কাছে, পর্দা প্রথা পালন করতে হবে, শরীয়তের অনুশাসন মানতে হবে। এতে জীবন নির্বাহ দুঃসহ হয়ে উঠবে ভেবে জয়গুন প্রথমে তওবা করতে অস্বীকার করলেও একদিকে সমাজের ভয় অন্যদিকে মাতৃত্বের টান -এই দুই সত্তার উপস্থিতিতে জয়গুন চরিত্রটিতে গতিময়তা এনে দিয়েছে। যদিও পরিস্থিতির চাপে এবং মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তা করে তাকে তওবা করতে হয় তবুও সে নির্দ্বিধায় প্রতিবাদ করে বলতে পেরেছিল – 'তওবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি নারীর প্রতিবাদী সত্তা মাতৃ সত্তার কাছে হার মানে। তাকে তওবা করতে হয়, সময়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক রূঢ় বাস্তবতার কাছে নারীকে কখনও কখনও নিরুপায় ভাবে মাথা নোয়াতে হয়। আবু ইসহাকের বিশ্লেষণ সেই সত্যদর্শন কালের স্রোতে হারিয়ে যায়নি। বরং সব আড়ালে রেখে পাঠক জয়গুনকে তাদেরই একজন বলে আবিষ্কার করেন। তার অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের নির্ভেজাল রূপটি আমরা আরো একবার লক্ষ করি অসুস্থ কাসুকে যখন আগলে রেখে সুস্থ করে তোলে, যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন তার মাতৃসত্তাকে বাধা দিতে পারেনি। 'নিজের হাত পা শরীর তুষের আগুনের তাপে গরম করে তারপর কাসুর কাঁথার নিচে শুয়ে তাকে নিজের বুকের তাপ দিয়ে গরম করবার চেষ্টা করে'। আবার মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে যখন কেউ তার নারীত্বের অপমান করতে চেয়েছে

সেখানে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার নারী সত্তার। জয়গুন চরিত্রটির মধ্যে এই দুই সত্তার সমান্তরাল প্রকাশ তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

জয়গুনের কর্মপটু ও সেবাপরায়ণ রূপ দেখে করিমবকস মুগ্ধ হয়ে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কথা বললে জয়গুন তা অনায়াসে ফিরিয়ে দেয়। অথচ তাকে একসময় অতর্কিত ভাবে বিতাড়িত করেছিল এই করিমবকস। পুরুষের চোখে দেখা জীবনে অভ্যস্ত শফির মায়ের মুখের ভাষা তাই বহন করে নারী দেহ লোভী স্বার্থপর পুরুষের লালসার ভাষা–'ঢক চেহারায় তো কম না। মাইনষে দ্যাখলে এখনো এক নজর চাইয়া দ্যাহে। সাইডের বান্দে ছান্দেও ঠিক আছে। এহনও নিকা দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা কাচ্চা হয়।' নারীর শরীর তার দুর্বলতার কারন হয়ে উঠে এসেছে সেই চর্যাপদের কাল থেকেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সর্বদা ভোগ সর্বস্ব বস্তু রূপেই পরিগণিত হয়। সময়ের পটপরিবর্তনে তার রূপান্তর ঘটেছে শুধুমাত্র, তা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি কোনো কালেই। তাই গদুপ্রধান যখন জয়গুনের শরীরের লোভে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে তা সরাসরি ফিরিয়ে দিয়ে জয়গুন বাঁচতে চেয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তার লড়াই সমাজে অন্যায় ভাবে তৈরি নারীর স্বাধীনতা হরণকারী সব বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে, জোবেদ আলী ও গদুপ্রধানের মতো ভেকধারী ভন্ডদের কামনা- বাসনা- লালসার বিরুদ্ধে, তার লড়াই করিমবকসের মতো সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদী স্বার্থপর বর্বরদের বিরুদ্ধে। যারা খাওয়া-পড়ার লোভ দেখিয়ে, আশা জাগিয়ে নারীর মর্যাদা হানি করতে চায়। তাই আজকের দিনে আধুনিক শিক্ষার ডিগ্রিধারীরাও যে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে জয়গুনের তীক্ষ্ণ বাণে তা অনায়াসেই প্রকাশ পায় সেই দেশভাগ পর্বের সময় কালেই – 'যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।'

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' এর ঝিনুকের প্রতিবাদী ঝংকার নারী সমাজের কাছে গর্বের মনে হলেও অবস্থানগত দিক থেকে জয়গুনের এই প্রতিবাদ নারীর জীবন পথে অনেক বেশি তাৎপর্যময়। যারা প্রতিবাদী নারী শক্তি, যারা পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় দুঃশাসনের ভয়ে প্রতিবাদী সুরকে প্রকাশ করতে পারেনি সেখানে জয়গুন সেই ভয়কে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী তীরের ফলা। মৌলিক দিক থেকে ঝিনুকের যে অবস্থান জয়গুনের সেই রকম অবস্থা ছিল না, তার না ছিল মাথার উপর আকাশ, না ছিল পা রাখার এক চিলতে ভূখণ্ড, এমনকি পুঁথিগত শিক্ষাও জয়গুনের ছিলনা। দেশভাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতি হলেও নারীর অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। সমাজ পতিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে নারীরা। সেখানে সময়কালের বিচারে জয়গুন হয়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতিবাদী নারীর প্রতিমূর্তি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'লালসালু' উপন্যাসের 'জমিলা' চরিত্রটি ইসলামী ধর্মতন্ত্রের নিরন্ধ্র প্রতাপের পটভূমিতে বিন্দু তুল্য অবস্থান রাখলেও তার প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের মধ্যে সিন্দুর নির্যাস ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তাই ব্রাত্যজনের প্রতিনিধি হয়েও তাদের মনের অবস্থানকে কখনোই ব্রাত্য করে রাখেনি, তাদেরই প্রতিনিধি জয়গুন। উপন্যাসের শেষে যা সত্য, যা বাস্তব ঔপন্যাসিক যেন সেই অলিখিত নিয়তির অনিবার্য রূপকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন মজিদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গদুপ্রধান যখন জয়গুনের কাছে আশাহত হয় তখন তার নেকড়ে দৃষ্টি সূর্য দীঘল বাড়ীর ভূতকে যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ফলে জয়গুনকে আবার সমঝোতা করতে হয় সমাজ-বাস্তবতার সাথে। খোদার দুনিয়ায় তারা ঘর ছাড়া পথিকে রূপান্তরিত হয়। সমালোচকের

ভাষায়- "ধর্মের 'অপ আক্রমণে'র বিরুদ্ধে জয়গুনকে দাঁড় করিয়ে লেখক গ্রামবাংলার ক্ষমতাবান পুরুষদের কৌশলী ষড়যন্ত্রের চিত্রকে উপহার দিলেন।.... পুরুষতন্ত্রের ছকভাঙা সাহসী জয়গুন বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়েছে তিন সন্তানের হাত ধরে"[৫]

সত্যি অর্থেই সবাক নারীর জন্য একটুও জায়গা সমাজ কোথাও রাখেনি, বলা ভালো দেয়নি। তাই সফীর মা যখন অসহায়তা প্রকাশ করে খোদার কাছে নালিশ জানায় তখন পোড় খাওয়া জয়গুনের মনের ভাবনা কোনো তল খুঁজে পায়না। কেননা এই সমাজের যারা খোদা, যাদের খোদকারিতে জয়গুনের মতো নারীদের বেঁচে থাকার চাবিকাঠি নির্ধারিত সেখানেই তাদের স্থানাভাব। জয়গুন এই শিক্ষা আত্মস্থ করেছে জীবনের পাঠশালায়। যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক সে নিজেই। তাই উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক খুব সুক্ষ ব্যঞ্জনায় নীড় হারানো পাখির মতো যন্ত্রনাকে যেন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন জয়গুনের শান্ত অথচ অনিশ্চিত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে, যে দৃষ্টিতে– 'চলতে চলতে আবার জয়গুন পিছন ফিরে তাকায়। সূর্য দীঘল বাড়ি।...রোদ-বৃষ্টি ও অন্ধকারে মাথা গুঁজবার নীড়। দিনের শেষে, কাজের শেষে মানুষ পশু পক্ষী এই নীড়ে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।' কিন্তু জয়গুনরা অনির্দিষ্টের পথে এগিয়ে চলে দেশ-কাল সময়কে পিছনে রেখে, পেছনের হাতছানি তাদের যাত্রাপথকে অবরুদ্ধ করতে পারে না। ধর্মের অনুশাসন ও তাদের গৃহবন্দি করতে ব্যর্থ হয়।

দেশভাগ মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'সূর্য দীঘল বাড়ী'(১৯৫০-৫১), কিন্তু কোথাও রাজনীতি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ছাপিয়ে যায়নি - এখানেই আবু ইসহাক কৃতিত্বের দাবিদার। এই পরিসর তৈরি না করলে আমরা জয়গুনকে হয়তো যথার্থভাবে খুঁজে পেতাম না। যদিও একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটির আলোচনা হওয়ায় সার্বিক অর্থে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি। এভাবে আলোচনার সুবিধা-অসুবিধা দুটোই আছে। সুবিধে হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মনোনিবেশ করানো, আর অসুবিধে হল তাতে আংশিকতার দোষ থেকে যায়। তবুও বলতে বাধা নেই যে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি, তার সংগ্রামের ইতিহাস, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে অবতরণ- সব মিলিয়ে উপন্যাসটি হয়ে উঠবে নারীর জীবন সংগ্রামের আলেখ্য। সমালোচকের মতে–"মানুষ চিরকালই সংকটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করে নতুন পথ। জীবন থেকে পালায় না তারা, তাদের গতি অব্যাহত থাকে নতুন থেকে নতুনতর ভূমির সন্ধানে। জয়গুন ও তার সন্তানরা চেনা-অচেনা শত্রুর মোকাবিলা করতে করতে শ্রান্ত হয়েছে, ধর্মীয় শাসনের পর্যুদস্ত হয়ে গেছে, ক্ষমতাবানের হাতে শোষিত হয়েছে - এক সময় হারিয়ে ফেলেছে মনোবল। কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি মানবতা। ... ব্যক্তি ক্লিষ্ট হয়, নিপীড়িত হয়, পরাজিত হয়- বৃহত্তর চেতনার পরাজয় নেই। সেই বোধ দিয়ে ইসহাক তৈরি করেছিলেন এমন মানুষ যা একই সঙ্গে ব্যক্তি ও নিখিল মানবসত্তার মিলিত রূপ- যা অবিনেশ্বর- অপরাজেয়"।[৬] সেই অবিনশ্বর অপরাজেয় জয়গুন পথে নেমেছে পথের সন্ধানেই। যে পথ সময়কালের গণ্ডি অতিক্রম করে মানবসত্তার পথকে মসৃণ করে তুলবে। কালোত্তীর্ণ নারীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আশাহত নারীর প্রাণে জীবন সঞ্চার করবে।

এই স্বল্প পরিসরে দেশভাগের পটভূমিতে নারী জীবনের সার্বিক চিত্র জয়গুন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব না হলেও, প্রয়াস ছিল পাঠকবর্গের কাছে একটা সামগ্রিক দিক উপস্থাপন করার। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাহিত্যানুরাগী পাঠক ও গবেষকদের নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা :

১) ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা: মননে ও সাহিত্যে, পৃষ্ঠা -৪১

২) আজাদ হুমায়ূন, নারী, পৃষ্ঠা – ৭০

৩) চৌধুরী বরুণজ্যোতি, নারী পরিসর সমাজে ও সাহিত্যে (সম্পাদনা), পৃষ্ঠা- ১৩৮

৪) খাতুন আফরোজা, বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর, পৃষ্ঠা- ১৪১

৫) তদেব পৃষ্ঠা- ১৪৫

৬) চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত, সময় ও সমাজ বাংলাদেশের উপন্যাস সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৮০

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

* ইসহাক আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫

সহায়ক গ্রন্থ:

* আজাদ হুমায়ূন, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

* খাতুন আফরোজা, বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

* চক্রবর্তী রামী, কথাসাহিত্যে নারী পরিসর ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩

* চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত, সময় ও সমাজ বাংলাদেশের উপন্যাস সংখ্যা, পরিকথা, পশ্চিমবঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ২০০২

* চৌধুরী বরুণজ্যোতি, নারী পরিসর সমাজে ও সাহিত্যে (সম্পাদনা), দি সী বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

* নেহার মোসাম্মাত সামশুন, মুসলিম নারীর কলমে মুসলিম নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

* ভট্টাচার্য তপোধীর, নারীচেতনা: মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭